Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, July 2025, TIRJ/July 25/article - 91
Website: https://tirj.org.in, Page No. 777 - 787
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - iii, Published on July issue 2025, Page No. 777 - 787
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(SJIF) Impact Factor 7.998, e ISSN : 2583 - 0848

বিনির্মাণ : প্রথা ভাঙার ব্যাকরণ

সঞ্জয় মণ্ডল
Email ID : Sanjoy.743290@gmail.com

Received Date *25. 06. 2025*
Selection Date *20. 07. 2025*

Keyword
Deconstruction, Derrida, Gayatri Chakravorty Spivak, Logos, Logocentrism, Sign, Signifier, Signified, Veda, Nagarjuna, Trace.

Abstract
The aim of deconstruction is to undermine the foundations of concepts such as center, truth, presence, and finality. According to Gayatri Chakravorty Spivak, Deconstruction unravels the seams of stable objects; it sends tremors through the seemingly well-established grounds of knowledge. Deconstruction is thus an active strategy of expressing discontent, discomfort, and scepticism toward any form of structural stability. Wherever there arises a binary opposition—such as primary/secondary, essential/non-essential, true/false, good/bad, centre/ periphery, high/low—where one term is privileged over the other as if it were naturally superior or self-evidently true, and where a narrative seeks to assert any kind of finality, deconstruction intervenes to question, destabilize, and expose the hollowness of such foundations.

Those who have been marginalized or suppressed to uphold these central or dominant categories become relevant again in the eyes of the deconstructionist. As Spivak notes, The essential question of deconstruction is: for the sake of proving something, what was left out? In a deconstructive reading of any text, these binary layers tend to collapse into each other. This is why Terry Eagleton described deconstruction as "reading against the grain."

Of course, there is no rigid methodology in deconstruction. The field of deconstruction has expanded greatly through the works of Derrida's contemporaries and successors. Yet, in all its forms, the primary goal of deconstruction remains to unseat the established.
Deconstruction views any notion of finality or stability with a sceptical eye—and does not stop at mere critique. It actively seeks to displace and undo such structures.

And finally, it must also be mentioned that in our discussion, we have not only explored the theory of deconstruction, but have also attempted to understand its relevance through a comparative analysis between Western philosophical traditions and Indian philosophical thought.

Discussion

ফরাসি দার্শনিক জাক দেরিদা প্রবর্তিত একটি বিশেষ পাঠ নির্ভর দৃষ্টিভঙ্গি 'Deconstruction'। দেরিদা স্বয়ং যদিও একে 'তত্ত্ব' বা 'পদ্ধতি' হিসেবে বিবেচনা করতে চাননি,[১] তবু আমাদের বক্তব্যকে একটি সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য দেওয়ার জন্য আমরা

একে চিহ্নিত করতে ঢিলেঢালা অর্থে 'পদ্ধতি' এবং 'তত্ত্ব'-এই দুটি শব্দেরই আশ্রয় নেব। যাইহোক, উপরিউক্ত বন্ধনীভুক্ত শব্দটির বাংলা তর্জমা কি হবে তা নিয়ে বেশ বিতর্ক রয়েছে। 'Deconstruction' শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'বিনির্মাণ' সবচেয়ে বেশি ব্যবহৃত হলেও একে 'অবিনির্মাণ', 'অবিসংযোগ' ইত্যাদি নামেও তর্জমা করার প্রবণতা চোখে পড়ে। ফলে, এই পদ্ধতি সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনায় প্রবৃত্ত হওয়ার পূর্বে বন্ধনীভুক্ত ইংরেজি শব্দটির বাংলা প্রতিশব্দ বিষয়ে দুই-এক কথা বলে নেওয়া প্রয়োজন।

ফরাসি ভাষায় লিখিত যে গ্রন্থে জাক দেরিদা এই পদ্ধতির প্রবর্তন করেছিলেন, তার নাম 'De La Grammatology' (১৯৬৭)। প্রায় একশো পাতার 'অনুবাদকের মুখবন্ধ' (Translator's Preface)-সহ 'Of Grammatolog' (১৯৭৬) নামে বইটি ইংরেজিতে অনুবাদ করেছিলেন এক বঙ্গ তনয়া, যাঁর নাম গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক। সম্ভবত স্পিভাকই প্রথম 'Deconstruction'-এর বাংলা প্রতিশব্দ হিসেবে 'বিনির্মান' শব্দটি ব্যবহার করেছিলেন। কিন্তু, পরবর্তীকালে তাঁর মনে হয়েছে Deconstruction-এর যে প্রবণতা 'বিনির্মাণ' শব্দটি তা সম্পূর্ণরূপে ধারণ করতে অক্ষম। তাই Deconstruction-এর প্রবণতাকে আক্ষরিক অর্থে ধরবার জন্যে এর প্রতিশব্দ হিসেবে তিনি 'অবিনির্মাণ' শব্দটি প্রস্তাব করেন। এই পরিবর্তনের কারণ হিসেবে তাঁর বক্তব্য, -

> "...ডিকন্সট্রাকশন তো শুধু বিশেষরূপে নির্মাণ নয়, বিশেষরূপে অনির্মাণও বটে।"[২]

ওই একই প্রবন্ধে এর অব্যবহিত পরে করা তাঁর আর একটি মন্তব্যও বেশ নজর কাড়ে, -

> "মধ্যবিত্ত চলিত বাংলা, যেটার আওতার মধ্যে আমরা সাধারণত ঘোরাফেরা করি, তাতে 'অবিনশ্বর'-এর মতো দুটো উপসর্গ দিয়ে বিপরীতার্থক শব্দের উদাহরণ আর দুটি নেই।"[৩]

গায়ত্রী দেবীর প্রতি বিনীত শ্রদ্ধা জানিয়েও তাঁর এই মন্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত হতে পারি না। প্রথমত, 'অবি' - এই দুটি উপসর্গ দিয়ে বাংলায় কেবল একটি শব্দ নয়, অভিধান খুললেই 'অবিনাশী', 'অবিপ্লুত', 'অবিমিশ্র', 'অবিমৃশ্য', 'অবিশঙ্ক', 'অবিশুদ্ধ' ইত্যাদি একাধিক শব্দ চোখে পড়ে। এমনকি 'Deconstruction'-এর যে প্রবণতার কথা তিনি বলছেন, অর্থাৎ, একাধারে 'বিশেষরূপে নির্মাণ' এবং 'বিশেষরূপে অনির্মাণ', 'অবিনির্মাণ' শব্দটি এই দ্বৈত অর্থ প্রকাশে অক্ষম। কেননা, 'অ' এবং 'অবি'— এই দুটি উপসর্গই কেবল বিপরীত অর্থ প্রকাশ করে। সেক্ষেত্রে 'অবিনির্মাণ' প্রতিশব্দে 'বিশেষরূপে নির্মাণ' অর্থটি অধরাই থেকে যায়। অন্যদিকে, যে দ্বৈত অর্থের ব্যঞ্জনা প্রকাশ করবার তাগিদে তিনি 'অবিনির্মাণ' শব্দটি প্রস্তাব করছেন, 'বিনির্মাণ' শব্দটি সেই উভয় অর্থ প্রকাশেই সক্ষম। কারণ, বাংলার 'বি' উপসর্গটি 'বিশেষ' এবং 'নেতি' বা 'বিপরীত' — এই দুটো অর্থই প্রকাশ করতে সক্ষম। সংসদ বাংলা অভিধানে 'বি'-উপসর্গ সম্পর্কে যা লেখা আছে এখানে তদ্গতভাবে তা উপস্থাপন করা যেতে পারে—

> "বি- বৈপরীত্য (বিপক্ষ); অভাব, বিহীনতা (বিগুণ, বিকল), মন্দত্ব (বিপথ), বিকার (বিবর্ণ), বিশেষ (বিখ্যাত) প্রভৃতি ভাবসূচক উপসর্গ বিশেষ।"[৪]

সুতরাং, Deconstruction-এর মূল প্রবণতা 'অবিনির্মাণ'-এর তুলনায় 'বিনির্মাণ' শব্দেই অধিক ব্যঞ্জিত হয় বলে আমরা মনে করি। আমরা আমাদের এই বক্তব্যের সমর্থন পাচ্ছি শিবাজী বন্দ্যোপায়ের 'অথ বিনির্মাণ' প্রবন্ধে— "De la grammatologie-'র প্রথম সংস্করণে এই পঠন-কৌশলের নামকরণ করেছিলেন দেরিদা (ইংরেজি অনুবাদে) destruction বা নাশন; পরে destruction-এর জায়গায় আসে deconstruction। Deconstruction-এও নাশকতার কম রঙ্গ নেই। আর সে রঙ্গ এখানেই যে, deconstructionist যে সে একযোগে দুই বিরুদ্ধ-দিকে হাঁটে— যেমন সে পাঠের পায়ে পায়ে হাঁটে, বজায় রাখে আভিমুখ্য, তেমনি সে অন্তর্ঘাতীও বটে, পাঠের প্রতিকূল-ও। তার পাঠের সফর সমুখ-বিমুখের যুগ্ম-সমর— বিনির্ণয়ে আছে সে, আছে বিনিবৃত্তিতে। এই যে এক কদম এগিয়ে দু-কদম পেছোনো কিংবা দু-কদম এগিয়ে এক কদম পেছোনো, সার্কাসের ভাঁড়ের মতো খেল, তার দ্যোতনা হয়তো মিলতে পারে বি উপসর্গে। কেননা, বি উপসর্গটি নিয়োগ বা নানাত্ব বা বিশেষ নির্বন্ধ বোঝাতে (যেমন, বিনিয়োগ, বিচিত্র, বিচূর্ণ) এবং পৃথগভাব বা বৈপরীত্য বা বৈরূপ্য বোঝাতে (যেমন, বিয়োগ, বিক্রয়, বিকেন্দ্রীকরণ) কাজে লাগে। 'বি' উপসর্গটির সঙ্গেই লগ্ন যেন ক্রীড়ামোদী difference-deferance-এর আভাস। সুতরাং, প্রস্তাব করা যাক deconstruction-এর যোগ্য বাংলা জোড়শব্দ

বিনির্মাণ।"[৫] আর একটি প্রতিশব্দের প্রস্তাব সম্পর্কে জানতে পারি গায়ত্রী দেবীর 'অবিনির্মাণ' প্রবন্ধেই। গায়ত্রী দেবীর সঙ্গে একান্ত আলাপচারিতায় তাঁর বন্ধু বিমলকৃষ্ণ মতিলাল 'Deconstruction'-এর বাংলা প্রতিশব্দ করতে বলেছিলেন 'অবিসংযোগ'। সেই প্রস্তাব তিনি প্রত্যাখ্যান করেছেন এই বলে –

> "ন্যায়বৈশেষিকের ধারণাটির মধ্যে যে অর্গানিজম বা প্রত্যঙ্গবাদ নিহিত আছে— বস্তু বিশেষরূপে ধৃত আছে বহুপ্রত্যঙ্গ সংযোগে— তা হয়তো অবিনির্মাণের ধারণাশৈলীর সঙ্গে খাপ খায় না।"[৬]

যাইহোক, উপরিউক্ত আলোচনার সাপেক্ষে 'Deconstruction'-এর বাংলা প্রতিশব্দরূপে 'বিনির্মাণ'কেই তুলনামূলক ভাবে আমাদের বেশি গ্রহণযোগ্য মনে হয়েছে এবং এই শব্দটিকেই আমরা আমাদের আলোচনার ক্ষেত্রে ব্যবহার করেছি।

ভারতীয় দর্শন ঘরানার সঙ্গে পাশ্চাত্যের দর্শন ঘরানার অনেক পার্থক্যের মধ্যে একটি, ব্যতিক্রম থাকলেও যুক্তি-নির্ভর পাশ্চাত্যের দর্শন সাধারণত ধর্মনিরপেক্ষভাবেই এগিয়েছে। অন্যদিকে, আধ্যাত্মিক ও ধ্যানজ্ঞান-নির্ভর ভারতীয় দর্শন ও ধর্ম পথ হেঁটেছে একে অপরের হাত ধরে। পাশ্চাত্যের ভাষা সংক্রান্ত দর্শন-ঐতিহ্য সুপ্রাচীন; এই দর্শন ঘরানার উদ্ভব, বিকাশ ও বিবর্তন পাশ্চাত্যের ভিন্ন দেশ-কাল-মানসে স্বতন্ত্র। তবে, একটু লক্ষ্য করলেই ধর্মের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত ভারতীয় দর্শন ঘরানার ভাষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পাশ্চাত্যের ভাষা সংক্রান্ত ধ্রুপদী, আধুনিক এবং উত্তর-আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গির বেশ কিছু সাদৃশ্য চোখে পড়বে। বিনির্মাণ সংক্রান্ত আমাদের এই আলোচনায় প্রাসঙ্গিকভাবে সেই দিকটিও স্বল্পবিস্তর আলোচিত হবে।

দেরিদা তাঁর 'Of Grammatology' গ্রন্থে পাশ্চাত্যের এক বদ্ধমূল ধারণাকে (science of presence) ব্যক্ত করতে 'metaphysics' (অধিবিদ্যা) শব্দটি ব্যবহার করেছেন।[৭] metaphysics বা অধিবিদ্যা মূলত পাশ্চাত্যের এক প্রগাঢ় আকাঙ্ক্ষার বহিঃপ্রকাশ, যা নিশ্চিত কর্তৃত্ব, সার্বিক সত্তা ও অর্থের চূড়ান্ততা কামনা করে। এই চূড়ান্ত সত্যকে তিনি 'trancendental signified' বলে অভিহিত করেছেন। trancendental signified হলো logos[৮]। গ্রিক ভাষায় Logos বলতে সাধারণভাবে বোঝায় 'শব্দ', তবে ধ্রুপদী দর্শনের আমল থেকেই তার সঙ্গে মিশে আছে যৌক্তিকতা ও জ্ঞানজড়িত অনুষঙ্গ। এই Logos বা যুক্তিকে দেখা হয় সমস্ত সত্য, জ্ঞান ও অর্থের কেন্দ্র হিসেবে; যা শুদ্ধ, সংগতিপূর্ণ ও সম্পূর্ন নিখুঁত। অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য Logos ধারণার অনুরূপ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করেছেন 'বেদ'-এর ক্ষেত্রে—

> "'বেদ' কথাটির উৎস ধাতু হল 'বিদ' যার অর্থ জ্ঞান। 'বেদ' হল শব্দরাশি, জ্ঞান, মহাগ্রন্থ, সমস্ত ভাবনার আকর। 'logos' এর-ই মতো।"[৯]

পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী দর্শন অনুযায়ী শব্দ এবং অর্থ অবিমিশ্র সত্যের বন্ধনে আবদ্ধ হয় যেখানে, তাই হল Logos। পরবর্তিকালে খ্রিস্টীয় ধর্মতত্ত্বে এই Logos-এর ধারণার ব্যপ্তি ঘটে অর্থ দাঁড়ায় 'ঈশ্বরের বাণী', যার লয় নেই, ক্ষয় নেই, নেই কোনও বিকৃতি—

> "In the beggining was the Word (মূল গ্রিকে logos), and the Word was with God, and the Word was God."[১০]

Logos-এর ধারণার অনুরূপ দৃষ্টিভঙ্গি লক্ষ্য করা যায় ভারতীয় দর্শনের শব্দব্রহ্মবাদী ধারণায়। এই মতানুসারে মনে করা হয়, শব্দ কেবল ধ্বনি নয়, বরং এর রয়েছে অর্থসহ এক অনন্ত অস্তিত্ব, যা চিরকালীন ও স্বতঃসিদ্ধ; শব্দ নিজেই এক ধরণের চেতনা বা ব্রহ্ম, যা চিরন্তন, স্বয়ংসম্পূর্ণ এবং জ্ঞানস্বরূপ। যাইহোক, metaphysics of presences-এর আকাঙ্ক্ষা এই logos-এ পৌঁছাবার আকাঙ্ক্ষা, দেরিদা যাকে বলেছেন logocentrism; যার অন্যতম বৈশিষ্ট্য অর্থের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রত্যাখ্যান করে সত্যের প্রতীতি গড়ে তোলা। দেরিদা এই logos-এর ধারণাকে fallacious বলে চিহ্নিত করেছেন। কারণ তাঁর মতে, logos-এর ধারণা আসলে বিভ্রান্তিকর, প্রতারণাপূর্ণ। তাই logos এর সঙ্গে fallas শব্দকে যুক্ত করে logocentrism-কে 'fallogocentrism' বলে উল্লেখ করেছেন। ফলত, বিনির্মাণবাদী সমালোচকের চোখে বৃহৎ অর্থে লোগোসেন্ট্রিজমের অন্য একটি ব্যাখ্যাও চোখে পড়ে। গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক লিখছেন—

> "...তার (অর্থাৎ বিনির্মাণের) দৃষ্টি যা ধোপে টিকেছে তার প্রতি— কী করে টিকল, কোন ফাঁসা জায়গায় কীসের তাপ্পি অথবা মাড় দিয়ে, তার প্রতি। এই তাপ্পি অথবা মার দেওয়ার ধাত বেঁচে থাকার ধাত,

> এটারই পোশাকি নাম লোগোসেন্ট্রিজম, তাপ্পি আর মাড় লোগোস দিয়ে তৈরি, লোগোস সহায় এবং আশ্রয়। তাপ্পি মারা যায় ন্যায়, অখণ্ড অদ্বৈত, শব্দব্রহ্ম, মানবাত্মা ইত্যাদিকে কেন্দ্র ধরে, কাটছাঁট করে। লোগোস শব্দও বটে ন্যায়ও বটে।”[১১]

শব্দের সঙ্গে অর্থের অদ্বয়সিদ্ধির বাসনাতেই প্লেটো-এরিস্টটল থেকে আরম্ভ করে রুসো-স্যসুর পর্যন্ত দার্শনিক ঐতিহ্য পরম্পরায় বদ্ধমূল হয়েছে এই ধারণা যে, লেখার তুলনায় কথা শ্রেষ্ঠ। কারণ, ধ্রুপদী দর্শনের আমল থেকেই এই ধারণা অটল প্রত্যয়ে রূপ নিয়েছে, অন্তরে উদ্গত হয় বস্তুর যে ধারণা, বক্তার কণ্ঠ নিঃসৃত ধ্বনির মাধ্যমে তা সরাসরি প্রকাশিত হতে পারে। আর লিখিত চিহ্ন সেই কথারই প্রতিনিধিত্ব করে। লেখার রয়েছে যেহেতু পুনরুৎপাদন যোগ্যতা, অর্থাৎ লেখকের অনুপস্থিতিতেও লেখাকে উপস্থাপন করা সম্ভব, ফলে, বহুপাঠকের হাতে পড়ে সম্ভবনা তৈরি হয় তার অর্থ বিকৃতির। পাশ্চাত্যের ধারণা অনুযায়ী, লেখা মূলত অনৃতপরায়ণ, লিখিত চিহ্ন তার শরীরে অসত্যের সম্ভবনাকে ধারণ করে নিয়ে চলে। অর্থের বহুগামীতার এই সম্ভবনাকে রুখবার জন্য দার্শনিক ঐতিহ্য পরম্পরায় লেখার তুলনায় কথাকে উচ্চ আসন দেওয়া হয়েছে। লেখার তুলনায় কথার এই অধিক গুরুত্ব দেওয়াকে দেরিদা অভিহিত করেছেন Phonocentrism নামে। Phonocentrism-এর অবিকল গুরুত্ব ভারতীয় দর্শনের ক্ষেত্রেও চোখে পড়ে। এই প্রবণতারই সর্বোৎকৃষ্ট উদাহরণ হিন্দু ধর্মগ্রন্থ ‘বেদ’। ‘বেদ’ ঈশ্বরের বাণী, অবিমিশ্র সত্যের আকর, যা প্রাথমিকভাবে কথ্য। ঋগ্বেদে উচ্চারিত ধ্বনিকে ‘বাক’ নামে অভিহিত করা হয়েছে। দেবীসূক্তের “অহং রুদ্রৈবির্বসুবিশ্চরাম্যহং...” মন্ত্রে এই বাক বা বাণীর প্রভূত মহিমা ও শক্তির কথা বর্ণিত হয়েছে। সূক্তটি শেষ হচ্ছে এইভাবে, আমি সেই শক্তি, যিনি সমস্ত জ্ঞানীদের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত— “জাতবিদাং সুপর্ণঃ”। এই ‘জাতবিদাং’ বা জ্ঞানী কারা? ঋগ্বেদের বাচস্পতি মন্ত্রে বলা হচ্ছে, চালনি দিয়ে যেমন ছাতু ছেঁকে নেওয়া হয়, যাঁরা বুদ্ধি এবং ধীশক্তির জোরে বিমিশ্র শব্দের মধ্যে থেকে বেছে বেছে শব্দ ব্যবহার করেন, তারাই জ্ঞানী, তাঁদের কথাতেই লক্ষ্মীর সৌন্দর্য তথা ‘বাক’ প্রতিষ্ঠিত। কারণ ভাষার যথোপযুক্ত ব্যবহারের মধ্যে দিয়েই পণ্ডিতদের প্রতিষ্ঠা হয়। সুতরাং, এখানেও সেই মৌখিক উচ্চারণেরই জয়জয়কার লক্ষিত হচ্ছে এবং উচ্চারণের জয়জয়কার শুধু নয়, শব্দের স্বেচ্ছাচারিতাকে প্রতিহত করবার জন্য যেন তাকে জ্ঞানীজনদের সীমিত পরিসরে বাঁধবারও একটা প্রচেষ্টা রয়েছে এর মধ্যে। এইসব phonocentrism, logocentrism এবং যাবতীয় উপস্থিতির অধিবিদ্যা দেরিদার আক্রমণের লক্ষ্য।

যাইহোক, পাশ্চাত্যের ভাষা সংক্রান্ত দার্শনিক ভাবনা এই যে, উচ্চারিত ধ্বনি হোক বা লিখিত শব্দ, তাতে আগেভাগে হতেই সত্যের অবিমিশ্র বন্ধনে আবদ্ধ আছে যে অর্থ, তাঁতে পৌঁছনোই শ্রোতা বা পাঠকের দায়িত্ব। ফলে, যাবতীয় অনর্থের সম্ভাবনাকে রুখে দিয়ে একমেবাদ্বিতীয়ম অর্থের মর্মমন্দিরে প্রবেশ করার বাসনাতেই ইউরোপীয় সভ্যতায় যুগে যুগে পোক্ত হয়েছে auctor, author কিংবা সমালোচকের (‘অথ বিনির্মাণ’ প্রবন্ধের ‘কে অথর’ অংশ দ্রষ্টব্য) ভিত্তি। কেননা, তাঁদেরই আছে সত্যকে প্রত্যক্ষ করার মতো দ্রষ্টা চক্ষু। ভারতীয় সমাজেও শব্দব্রহ্মের শিল্পীদের প্রজাপতি ব্রহ্মার আসনে অধিষ্ঠিত করা হয়েছে। কেননা, তাঁর সৃষ্ট জগৎও তো ব্রহ্মস্বাদ সহোদর। আর সেই জগতের আস্বাদ নেওয়াও যার-তার কর্ম নয়; পাঠককে হতে হবে ‘সহৃদয় সামাজিক’; অথবা পাঠকৃতির সঠিক সটীক অর্থ করে দেওয়ার জন্য প্রয়োজন কোনও টীকাকার বা সমালোচকের।

যাইহোক, প্লেটো-এরিস্টটল থেকে স্যসুর পর্যন্ত কথা/ লেখার দ্বৈত বিন্যাসে কথার প্রতি লক্ষিত হয় এইরূপ অনাবশ্যক পক্ষপাত। অবশ্য **১৯১৬** সালে প্রকাশিত স্যসুরের ‘Course in General Linguistics’ গ্রন্থের মধ্যে দিয়ে পাশ্চাত্যের ভাষাবিজ্ঞান চর্চায় এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয় তিনটি। প্রথমত, এই গ্রন্থে স্যসুর যেকোনো জীবন্ত ভাষাকে যুগপৎ দুটি মাত্রায় বিভক্ত করেন— Diachronic বা কালানুক্রমিক এবং Synchronic বা স্থানানুক্রমিক বা এককালিক। ভাষার কালানুক্রমিক মাত্রাকে পাশ কাটিয়ে তিনি তাঁর গবেষণার লক্ষ্যস্থান নির্বাচন করে নেন ভাষার এককালীক মাত্রায়। যেখানে জ্ঞাতব্য, নির্দিষ্ট কোনও কালখণ্ডে ভাষার সবিশেষ গঠনরূপটি ঠিক কোন প্রকারের। দ্বিতীয়ত, স্যসুর তাঁর গবেষণার লক্ষ্য নিবিড়ভাবে কেন্দ্রীভূত করবার জন্য ভাষার আরও দুটি ক্ষেত্রভাগ করেন— Langue বা ভাষাতন্ত্র ও Parole বা বাচন। Parole হল ভাষার ব্যক্তিক প্রয়োগ, অন্যদিকে langue হল সেই সকল নিয়মের সমষ্টি, যাদের সাপেক্ষে অর্থবহ হয় ব্যক্তি-উচ্চারণ ও বিনিময়। স্যসুরের মতে, ভাষার কালানুক্রমিক ও একক বাচনের পরিবর্তে

ভাষাগবেষণার লক্ষ্য হওয়া উচিৎ ভাষাতন্ত্রের (langue) স্থানানুক্রমিক (syncronic) বিশ্লেষণ। 'Course in general linguistics' গ্রন্থে স্যসুরের তৃতীয় প্রতিপাদ্য বিষয় হল তাঁর চিহ্ন (sign) কেন্দ্রিক আলোচনা। লেখা হোক বা কথা, স্যসুরের মতে ভাষা আসলে কতিপয় চিহ্নের সমাহার। আর চিহ্নমাত্রই দ্বি-অঙ্গ বিশিষ্ট, "প্রত্যেক ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন এমন এক 'মনস্তাত্ত্বিক পদার্থ' ('psychological entity') যার রয়েছে দুই দ্বার : 'ধারণা' ('Concept') ও 'ধ্বনিচিত্র' ('Sound Image')। 'ধারণা' ও 'ধ্বনিচিত্রে'র যুগলবন্দীতে উপজাত হয় চিহ্ন। শুনতে যতই মধুর হোক, শব্দদুটি কিন্তু বড্ড বারোয়ারি। এদের জায়গায় (নির্দিষ্টতায় নিশ্চিত) পারিভাষিক শব্দ না কায়েম হলে অযথা গণ্ডগোল বাধবে, এ আশঙ্কায় নতুন দুটি তত্ত্বমূলের আমদানি করেন স্যসুর : 'ধারণা'র পরিবর্ত হয় 'চিহ্নন' (Signified), 'ধ্বনিচিত্রে'র 'চিহ্নক' (Signifier)।"[১২] অর্থাৎ, 'চিহ্নক' হল কোনো শব্দের লিখিত বা উচ্চারিত রূপ, যা একটি বস্তুগত উপাদান, যা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য। যেমন, গাছ, বিড়াল, মানুষ ইত্যাদি শব্দের লিখিত বা উচ্চারিত ধ্বনিরূপটি হল 'চিহ্নক'। অন্যদিকে বস্তুর বিমূর্ত ধারণা বা মানস-ছবি হল 'চিহ্নন'। যেমন, 'গাছ' শব্দটি শুনলে বা দেখলে আমাদের মনে যেমন ছবি তৈরি হয়— একটি লম্বা কাণ্ডবিশিষ্ট, শাখা-প্রশাখা ও পাতাযুক্ত সবুজ উদ্ভিদ, এটিই সিগনিফাইড বা চিহ্নন। অর্থাৎ, সহজ কথায়, লিখিত বা উচ্চারিত ধ্বনিচিত্রটি হল চিহ্নক, আর তার থেকে উপজাত অর্থটি হল চিহ্নন। স্যসুরীয় চিহ্নতত্ত্বের প্রাথমিক সিদ্ধান্ত এই, "ভাষাতাত্ত্বিক চিহ্ন বস্তু আর নামকে সম্পৃক্ত করে না, করে চিহ্নক আর চিহ্ননকে (The linguistic sign unites, not a thing and a name, but a concept and a sound-image)"[১৩] এবং লক্ষ্যণীয়, স্যসুর এই গ্রন্থে ঘোষণা করছেন, - "ভাষাচিহ্নমাত্রে কাকতালীয় (The linguistic sign is arbitrary)"[১৪] এবং "চিহ্নক-চিহ্ননে আবশ্যিক, চিরস্থায়ী কোনো বন্ধন নেই"[১৫]। অর্থাৎ, শব্দ ও অর্থের যে জোড়সন্ধি তা আসলে এক সামাজিক চুক্তির ফসল এবং সেই সম্পর্কও নিতান্ত কাকতালীয়, যা ক্ষরণশীল ও আপতিক। শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায় বিষয়টিকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে— "চিহ্নক-চিহ্ননে আবশ্যিক, চিরস্থায়ী কোনো বন্ধন নেই"— এ প্রস্তাব কবুল করার মানে দাঁড়ায়, এ-ও কবুল করা যে, ব্যবহারে-ব্যবহারে, প্রয়োগের অনন্তরতায় যতই না সবিশেষ শব্দসমস্তে শীলিত-অভ্যস্ত হই আমরা, যতই বানাই পুঙ্খে অনুপুঙ্খে সমৃদ্ধ অভিধান, বস্তুজগতের সঙ্গে ভাষারাজ্যের মৌল সম্বন্ধে প্রাক-নির্ধারিত, সুনিশ্চয় কোনো অনুবন্ধ নেই। অসাধ্য অতএব ভাষার মাধ্যমে পদার্থ-দুনিয়ার, প্রপঞ্চময় বিশ্বের অবিকল পাঠ-পঠন। লব্ধ যা আমাদের, বোধ্য যা, তা কেবল চিহ্নক-চিহ্নন, চিহ্ন ও বস্তুর (ক্ষরণশীল, ভঙ্গুর) আন্তঃসম্পর্ক। আর সে (অনির্ভরযোগ্যতায় স্বনির্ভর) আন্তঃসম্পর্কই আমাদের যাবতীয় ধারণার বুনিয়াদ।"[১৬] চিহ্নক-চিহ্ননে, শব্দ ও বস্তুতে যদি পূর্বনির্ধারিত স্বতঃসিদ্ধ কোনো সম্পর্ক না-ই থাকে তাহলে শব্দ থেকে অর্থ নিষ্পত্তি ঘটে কিভাবে? ঘটে নেতিকরণের মাধ্যমে। স্যসুরের অভিমত, ভাষার এককগুলোর (যেমন শব্দ, বর্ণ, ধ্বনি) নিজস্ব কোনো অর্থ নেই, বরং এগুলি পারস্পরিক পার্থক্যের মাধ্যমে অর্থ সৃষ্টি করে— "In language there are only differences without positive terms."[১৭] অর্থাৎ, একটি শব্দের অর্থ তখনই বোঝা যায়, যখন এটি অন্য শব্দ বা ধ্বনির থেকে আলাদা হয়। যেমন, 'কালো' শব্দটি অর্থবোধক কারণ এটি 'সাদা' থেকে আলাদা। স্যসুরের এই প্রত্যয় পাশ্চাত্য ভাষাবিজ্ঞান চর্চার ইতিহাসে দিকদর্শন হলেও সার্বিক বিচারে তাকে সম্পূর্ণ অভিনব বলা যায় না। কারণ, স্যসুরের বহু পূর্বে ভারতীয় বৌদ্ধ দার্শনিক নাগার্জুন তাঁর গ্রন্থ 'মূলমধ্যমককারিকা'য় ভাষাকে প্রসঙ্গনির্ভর ক্ষণভঙ্গুর সামাজিক চুক্তির ফল, এবং ভাষার অর্থোৎপাদনে দ্বৈত বিপরীতের ভূমিকার কথা বলেন[১৮]। নাগার্জুনের ভাষা-দর্শনের সঙ্গে পরবর্তীকালে দেরিদার বিনির্মাণী বিশ্লেষণেরও সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যাবে। তবে, নাগার্জুনের সঙ্গে বিনির্মাণবাদী দৃষ্টিভঙ্গির কিছু পার্থক্যও রয়েছে। নাগার্জুন বিশ্বাস করতেন, ভাষা সর্বদা পারস্পরিক নির্ভরশীলতার মধ্যে দিয়ে অর্থ তৈরি করে, কিন্তু পরমার্থ বা প্রকৃত সত্য এই দ্বৈততার বাইরে। ফলে, নাগার্জুনের মতে, ভাষা পরমার্থ বা প্রকৃত সত্যকে সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করতে পারে না; তাই নাগার্জুনের কাছে, কিছু বলা মানে তাকে মিথ্যা করে দেওয়া। কিন্তু গায়ত্রী দেবী নাগার্জুনের ভাষাদর্শনকে 'অবিনির্মাণী' (বিনির্মাণী) হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পাশাপাশি একথাও বলছেন, বিনির্মাণবাদীর কাছে "এই তথাকথিত মিথ্যাই তথাকথিত সত্য, এর চাইতে অধিক সত্য নেই অথবা আহরণ করা যায় না সত্য একটি অতিক্ষয়িষ্ণু শব্দ।"[১৯]

তাহলে দেখা যাচ্ছে, পাশ্চাত্যের ধ্রুপদী দর্শন এবং প্রাচ্যের বৈদিক বা আস্তিক্য দর্শন ভাষাকে লোগোস কিংবা চূড়ান্ত সত্য প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বিবেচনা করেছে, বৌদ্ধ ধর্মের মাধ্যমিক দর্শনে চূড়ান্ত সত্যকে প্রচলিত ভাষা-রাজ্যের

বাইরে অবস্থিত স্বতন্ত্র অস্তিত্ব হিসেবে দেখা হয়েছে এবং মনে করা হয়েছে, ভাষা সেই চূড়ান্ত সত্য প্রকাশে অক্ষম, আর বিনির্মাণী দৃষ্টিভঙ্গিতে সত্যের ধারণাকেই আপতিক এবং ভাষার মাধ্যমে প্রকাশিত সমস্ত অর্থকেই আপতিক সত্য হিসেবে দেখা হয়েছে।

যাইহোক, স্যসুর প্রবর্তিত এই চিহ্নতত্ত্ব ও 'Synchronic analysis'-এর হাত ধরেই জন্ম নেয় Structural Linguistics বা গঠনবাদী ভাষাতত্ত্ব। এবং এই গঠনবাদী দৃষ্টিভঙ্গি অচিরেই ভাষাবিদ্যার সীমানা ছাড়িয়ে প্রভাব বিস্তার করে নৃতত্ত্ব, সাহিত্য-সমালোচনা এবং দেখতে দেখতে প্রায় সমাজবিদ্যার সকল শাখায়। এই গঠনবাদ হল এমন এক তাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা বলে যে, মানুষের চিন্তা, সংস্কৃতি ও ভাষা নির্দিষ্ট কাঠামোর উপর ভিত্তি করে গঠিত, এগুলির অর্থ বোঝার জন্য তাদের অন্তর্নিহিত কাঠামো বিশ্লেষণ করা জরুরী। এছাড়াও এই দৃষ্টিভঙ্গিতে কোনো কিছুর অর্থ বোঝার জন্য তার আলাদা আলাদা অংশ নয়, বরং সমগ্র কাঠামোর বিবেচনাই লক্ষ্য। গঠনবাদী প্রকল্পের এই লাং/ প্যারোল বিভাজন এবং একক বাচনকে পরিহার করে ভাষাতন্ত্রের অনাবশ্যক পক্ষপাতের মধ্যে প্লেটোর আইডিয়াল/ রিয়ালের আধিবিদ্যক ভাববাদী জুটির ছায়া লক্ষ করেছিলেন ফরাসি মার্ক্সীয় ভাবুক Pierre Macherey। তাঁর মতে, প্লেটোর দুনিয়ায় নানাত্বে আপেক্ষিক, ভঙ্গপ্রবণ, ছড়ানো-ছিটানো রিয়াল যেমন একত্বে অনাপেক্ষিক, অটুট, আপনাতে ভরাট, স্বরাট আইডিয়ালের বি-পরিণত অনচ্ছ কপি, ঠিক তেমনই স্যসুরের দৃষ্টিভঙ্গিতে একক বাচনও যেন স্বরাট ভরাট ভাষাতন্ত্রের অনচ্ছ কপি। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে এই একক বাচনকে পাশ কাটিয়ে কাঠামোর বিশ্লেষণ করাকে তিনি প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন এইভাবে—

> "এর মানে তো এই, সমস্ত পাঠে— সে-পাঠ কথিত বাচন হোক বা মুদ্রিত বাচন— আগে-হতেই উৎকীর্ণ আছে অবিচল এক সারার্থ। এবং ওই পূর্বোল্লিখিত, অন্তর্নিহিত তাৎপর্যটিকে উদ্ধার করাই পাঠকের কাজ। সেই সঙ্গে, (প্লেটোরই যুক্তি-ধাঁচা অনুসরণ-পূর্বক) পৌঁছোই তো আমরা (অ-পূর্ব) এ সিদ্ধান্তে : (অনড়) ভাবকল্প সম্পর্কে অনবহিত জনতার মতো, তালিমি-শিক্ষার অ-ভাবে অপরিণতবুদ্ধি পাঠকও বইপত্র সম্পর্কে আনশানই বকে : সুদীক্ষিত সমালোচকই কেবল (প্লেটোনিক দার্শনিকের মতোই) প্রবেশ করে সোজা (কোষবদ্ধ) অর্থের মর্ম-মন্দিরে।"[২০]

অবশ্য গাঠনিকতাবাদ বা অবয়ববাদী দৃষ্টিভঙ্গির মূল আপ্তবাক্য, "বাস্তবতা কেবল ভাষার মাধ্যমে উপলব্ধ"[২১], এবং "ভাষা ও অর্থ পার্থক্যের মাধ্যমে গঠিত"[২২], যা পরবর্তীকালে উত্তর-অবয়ববাদ এবং তার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সম্পৃক্ত বিনির্মাণবাদকেও প্রভাবিত করেছে।

যাইহোক, একক বাচনকে পাশ কাটিয়ে স্যসুর যেখানে ভাষাতন্ত্রের (lang) আলোচনাই ভাষা-গবেষণার কেন্দ্র বিবেচনা করেছিলেন, দেরিদা সেই অবহেলিত একক বাচনকেই কেন্দ্রে নিয়ে এসে তাঁর আলোচনার আধেয় করে তোলেন এবং কথার প্রতি পাশ্চাত্যের মাত্রাতিরিক্ত পক্ষপাত-যুক্ত বদ্ধমূল ধারণাকে ধ্বস্ত করে ধ্রুপদী দর্শনের যুগ থেকে 'অপর' হিসেবে বিবেচিত 'লেখা'কে গুরুত্বের বিচারে 'কথা'র সমান আসনে প্রতিষ্ঠিত করেন। 'Of Grammatology'-তে দেরিদার কাজ শুরু হয় স্যসুরের ব্যাখ্যা করা 'পার্থক্য' (Deference)-এর ধারণা দিয়ে। স্যসুরের অভিমতকে প্রসারিত করে দেরিদা বলেন, অর্থ কোনো একক চিহ্নে উপস্থিত থাকে না, বরং তা অন্যান্য চিহ্নের সঙ্গে সম্পর্কিত এবং অসংখ্য অনুপস্থিত চিহ্নের শৃঙ্খলে সেই চিহ্নের উপস্থিতির ওপর নির্ভরশীল। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আমরা যখন 'বিড়াল' বলি, তখন বুঝি সেটা কুকুর নয়, ছাগল নয়, ঘোড়া নয় ইত্যাদি। উপস্থিত 'বিড়াল'-এর অর্থ নির্ভর করে অনুপস্থিত অসংখ্য 'না-বিড়াল'-এর উপর। দেরিদার মতে, ব্যাখ্যা হল এই অনন্ত চিহ্ন-শৃঙ্খলের মধ্যে দিয়ে চলার অন্তহীন এক প্রক্রিয়া, যেখানে প্রতিটি চিহ্ন (signifier) কোনো নির্দিষ্ট 'চূড়ান্ত চিহ্নন' (end signified)-এর দিকে নিয়ে যায় না, পরন্তু আর একটি চিহ্নের দিকে পরিচালিত করে। অর্থ কখনোই কোনো একক চিহ্নে স্থির থাকে না, বা পক্ষান্তরে এ-ও বলা যায়, একটি চিহ্ন কখনোই কোনো একক অর্থ নিবেদন করে না, বরং অর্থ সর্বদা বহুত্বে ছড়িয়ে পড়ে। অর্থের এই বিচ্ছুরণকে দেরিদা নাম দিয়েছেন 'Dissemination'— "…'dissemination' the seed that neither inseminates nor is recovered by the father, but is scattered abroad."[২৩] বিনির্মাণী দৃষ্টিকোণ থেকে তাই অর্থ (meaning) হল — "a kind of constant flickering of presence and absence together."[২৪]

প্রতিটি চিহ্ন তাই অন্য অনুপস্থিত চিহ্নগুলোর একটি ছাপ রেখে যায়। সেই অনুপস্থিত চিহ্নগুলোর ছাপ বা ছায়াকে ব্যক্ত করবার জন্য দেরিদা একটি পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করেন— 'trace'। 'trace' হল লেখার একটি তাত্ত্বিক একক; এটি লেখার অভ্যন্তরীণ স্তরে কাজ করে। এটি সর্বত্র বিরাজমান, কিন্তু একে ধরা যায় না। 'trace' হল সেই সকল সম্ভাব্য সম্পর্কের যোগফল, যা একটি চিহ্নকে গঠন করে। 'trace' হল "...কোনো উপস্থিতির অনুপস্থিতির দাগ, ইতো-সাব্যস্ত কোনো অনুপস্থিত উপস্থিতের অভিজ্ঞান।"[২৫] 'Of Grammatology' গ্রন্থের অনুবাদকের মুখবন্ধে স্পিভাক দেরিদার 'trace'-এর ধারণাকে ব্যাখ্যা করেছেন এইভাবে— "The structure of the sign is determined by the trace or track of that other which is forever absent."[২৬]

স্যসুরীয় ভাষাতত্ত্বে অর্থোৎপাদনের পরম গতি হিসেবে স্বীকৃত ছিল ভেদ বা পার্থক্যের ধারণা। দেরিদা সেই ভেদের ধারণার সঙ্গে যুক্ত করেন সময় ও পরিসরের দ্যোতনা। দেরিদা যুক্তি দেন যে, অর্থ কেবলমাত্র পার্থক্যের মাধ্যমে উপলব্ধ হয় না, বরং অর্থের কোনো চূড়ান্ত অবস্থা কখনোই অর্জিত হতে পারে না। কারণ, প্রতিটি চিহ্নন (signified) কেবল ইঙ্গিত করে অন্য চিহ্নকের (signifier) দিকে। বিষয়টিকে সহজে বোঝা যেতে পারে এইভাবে, অভিধানে কোনও একটি শব্দের একাধিক অর্থ থাকে, সেই প্রতিটি অর্থের আবার থাকে আরও একাধিক স্বতন্ত্র অর্থ, এভাবে একটি শব্দের অর্থ অনিঃশেষ প্রক্রিয়ায় ধাপে ধাপে নানাত্বে ছড়িয়ে যেতে থাকে। তাই অর্থ সবসময় পরিবর্তনশীল ও প্রসঙ্গ-নির্ভর। ফলে, অর্থ সর্বদা একদিকে পৃথক (differing) এবং অন্যদিকে অনির্দিষ্টভাবে বিলম্বিত (deferred) হতে থাকে। এই দুই বৈশিষ্ট্যের একসঙ্গে অস্তিত্ব বোঝাতে দেরিদা 'différance' শব্দটি তৈরি করেন, যেখানে differ এবং defer — উভয় অর্থই নিহিত।

এইভাবে দেরিদা তাঁর আলোচনায় চিহ্ন ও অর্থ গঠনের প্রক্রিয়াকে বিশ্লেষণ করে অর্থের পৌনঃপুনিকতার ধারণাকে খণ্ডন করেন এবং পাশ্চাত্যের দার্শনিক-পরম্পরায় আবহমান লিখন নিন্দার প্রত্যুত্তর দিতেই যেন সচেতনভাবে 'লিখন' শব্দটির অর্থব্যাপ্তি ঘটান— "Within the work of historical repression, writting was, by its situation, destined to signify the most formidable difference...[Let us] persist in calling that difference writing… because it essentially communicates with the vulgar concept of writing."[২৭] শিবাজি বন্দ্যোপাধ্যায়ের ব্যাখ্যায়, "লিখন' এখানে শুধু কাগজ বা ভূর্জপত্র পর পেনসিল বা কলম-স্টাইলাস সহকারে কাটা আঁচড়াদি নয়, বরং তা গোটা এক অনুসন্ধান-প্রকল্পের অভিধা— যে অবদমন-বহিষ্করণ মারফত তার আধিবিদ্যক বদ্ধাঞ্চলটি টিকিয়ে রাখে অক্ষরকেন্দ্রিক বয়ান, তার-ই নির্দেশক-পদ 'লিখন'।"[২৮] অর্থাৎ, 'লিখন' বলতে তিনি বুঝিয়েছেন, যেকোনো ব্যবস্থাকে, যা পার্থক্য (difference) এবং বিলম্বন (deference) বা দেরিদীয় পরিভাষা অনুযায়ী দিফেরাঁস (didderance)-এর ভিত্তিতে গঠিত। এই বিচারে দেরিদা দেখাচ্ছেন 'কথা'র মধ্যেও রয়েছে 'লিখন'-সাপেক্ষতা। অর্থাৎ, তিনি দেখান 'লেখা'র মতোই 'কথা'র-ও অর্থ উৎপন্ন হয় পার্থক্যজনিত সম্পর্কের মাধ্যমে। তিনি বলেন, যেমন আমরা ভাষার উচ্চারণ, স্বরক্ষেপণ বা টানের পার্থক্যগুলো উপেক্ষা করি অর্থ বুঝতে, তেমনি আমরা লেখায় স্টাইল, অক্ষরের আকার, ফন্ট বা আকৃতি উপেক্ষা করি অক্ষরের সার বুঝতে, যা মূলত অন্যান্য অক্ষরের থেকে তার পার্থক্যের মাধ্যমে গঠিত। দেরিদা দেখান যে, লেখার তথাকথিত নিম্নমানের বৈশিষ্ট্য-যেমন সময়ের বিলম্ব, লেখকের থেকে স্থানিক দূরত্ব-এসব বৈশিষ্ট্য 'কথা'র সঙ্গেও যুক্ত।

এই ধারণা বোঝায় যে অর্থ এক ধরনের বিভেদের ও লেখনের স্বেচ্ছাচারী ফলাফল। কোনো লেখা সর্বদা অন্য কোনো অস্তিত্ব বা অনুপস্থিত চিহ্নের দিকে নির্দেশ করে। অর্থাৎ, অর্থ কখনোই স্থির নয়; এটি সর্বদা এক চিহ্ন থেকে অন্য চিহ্নের দিকে সরে যায়, এবং তা কখনোই কোনো পরম চিহ্নের (transcendental signified) ওপর থামে না। এই উপপত্তি অনুসারে একটি text বা পাঠকৃতিরও কোনও সার্বজনিন গ্রহণযোগ্য অর্থ নেই। দেরিদার মতে, কোনো লেখকের ইচ্ছে অনুযায়ী পাঠ সীমাবদ্ধ থাকে না এবং সাহিত্যের কোন চূড়ান্ত ব্যাখ্যাও সম্ভব নয়। সমস্ত বিশ্লেষণ এবং ব্যাখ্যা অস্থায়ী, অনির্দিষ্ট ও চঞ্চল। পাঠের এই সতত সঞ্চলতার কথা বলতে গিয়ে 'Of Gramatology' গ্রন্থের 'Translator's Preface'-এ গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাক লিখছেন—

> "The text has no stable identity, no stable origin, no stable end. Each act of reading the 'text 'is a preface to the next. The reading of a self-professed preface is no exception to this rule."[২৯]

বিনির্মাণবাদী সমালোচকের কাছে তাই 'পাঠ' হয়ে যায় অনন্ত আন্তঃপাঠ্যতার নামান্তর—

> "The text thus has no borders, and there can be no limits to intertextuality."[৩০]

সাহিত্য পাঠের জগতে দেরিদার অবদান সম্পর্কে বলতে গিয়ে অধ্যাপক তপোধীর ভট্টাচার্য লিখছেন—

> "ভাষ্য কেবল বৌদ্ধিক ক্রিয়া নয়, আনন্দেরও সঞ্চরণ এবং এই জন্যে পাঠকৃতিকে নিয়ন্তার শক্ত মুঠোয় চেপে ধরার কোনো দরকার নেই— এই হল দেরিদার কাছে আমাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রাপ্তি।"[৩১]

দেরিদার সমসাময়িক দার্শনিক রোলাঁ বার্থও অর্থের এই বহুগামীতার প্রসঙ্গ উত্থাপন করে স্রষ্টা লেখকের সর্বময় কর্তৃত্বের মানে মানে বিদায়-ঘণ্টা বাজিয়ে দিয়েছিলেন তাঁর 'The Death of the Author' প্রবন্ধে—

> "Barthes here announced that all texts are connected to all others in an unending chain of intertextual relations. He announced that the text is produced (and not consumed) by the reader. A text is thus plural in origin, and polysemic in nature. There is no definite 'margin' or 'centre' to a text : every text is a wave of many other texts."[৩২]

এই বহুস্বরের স্বীকৃতিই উত্তর-অবয়ববাদ কিংবা উত্তর-আধুনিকতা কিংবা বিনির্মাণবাদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য।

যাইহোক, দেরিদার কৃৎকৌশলকে ব্যবহার করা হয় একটি পাঠের আপাত বিরোধ, বৈপরীত্য, অর্থের পরিবর্তন, অনুপস্থিতি, নীরবতা ও গোপন অর্থগুলো সন্ধান করবার অভিপ্রায়ে। বিনির্মাণবাদী সমালোচকদের মধ্যে শব্দের উৎপত্তি বা ব্যুৎপত্তিগত (etymology) বিশ্লেষণের প্রতি প্রবল আগ্রহ দেখা যায়। কারণ, এই পদ্ধতিতে একটি শব্দের বিকল্প অর্থও কখনো কখনো উন্মোচিত হয়ে যায়, অনেক সময় যা প্রচলিত অর্থের সম্পূর্ণ বিপরীত। এর ফলে এই সত্য প্রমাণিত হয় যে, শব্দের উপর কোনো একক, নির্দিষ্ট বা চূড়ান্ত অর্থ আরোপ করা সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ দেরিদার 'Of Hospitality' গ্রন্থে আলোচিত 'Guest' শব্দের আলোচনা উদ্ধার করা যেতে পারে। 'guest' শব্দটি 'host' শব্দের সঙ্গে সম্পর্কিত (উভয়ের ল্যাটিন মূল 'hospes', যার অর্থ guest-ও হতে পারে, host-ও হতে পারে) এবং 'host' শব্দের উৎপত্তি ল্যাটিন 'hostis' থেকে, যার অর্থ 'শত্রু'। এর অর্থ দাঁড়ায় যে, কোনো অতিথির আগমন মূলত এক প্রকার অনাহূত আগমনও হতে পারে— শত্রুর মতো। তৎসম 'অতিথি 'শব্দের ব্যুৎপত্তিগত অর্থও অনেকটা এই ব্যঞ্জনা প্রকাশ করে— অতিথি = অ+তিথি, অর্থাৎ যে ব্যক্তির আগমন তিথি-নক্ষত্র দেখে এবং আগমনবার্তা ঘোষণা করে ঘটে না, ঘটে সম্পূর্ণ আকস্মিক ও অনাহূতভাবে। দেরিদার মতো নাগার্জুনও তাঁর 'মূলমধ্যককারিকা' গ্রন্থে প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য শব্দের ব্যুৎপত্তিগত বিশ্লেষণে ফিরে যেতে বলেছিলেন, যা 'নিরুক্তি পথ' নামে পরিচিত।[৩৩]

যাইহোক, ভাষা ও শব্দ কেন্দ্রিক সুদীর্ঘ আলোচনার পরেও একথা বলতে হয়, ভাষা ও শব্দের একরৈখিক অর্থ খণ্ডন করাই বিনির্মাণের একমাত্র উদ্দেশ্য নয় কেবল, কিংবা সাহিত্যের বিনির্মাণবাদী পাঠের ক্ষেত্রে কেবলমাত্র ভাষা এবং কেবলমাত্র নির্দিষ্ট কোনো বহুত্বগামী শব্দই বিনির্মাণের একমাত্র সহায় এবং অবলম্বনও নয়। বিনির্মাণের চোখে ভাষার গুরুত্ব অসীম, তবে ভাষাই সর্বস্ব নয়। শ্রীমতী স্পিভাক লিখছেন— "অবিনির্মাণের দৃষ্টিতে ভাষা ঠেকিয়ে রাখে অহৈতুক অকারণ অসংলগ্ন অর্থহীন অনর্থকে— র‍্যান্ডমনেস, র‍্যাডিকাল, অলটেরিটির সম্ভাবনা থেকে। আবার অনর্থ এবং পরম অপরের একমাত্র অক্ষম নিশানাও ভাষায়। ভাষাও হয়তো একটা তাপ্পি, মৌলিক তর্ক অনর্থকে নিয়তই ঢেকে রাখে, সূত্রাবলীর জাল, গ্রন্থের গ্রন্থি ভুলিয়ে দেয় যে জগতের জাল চিরচ্ছিন্ন হওয়ার কোনো সংগত বাঁধা নেই।"[৩৪] তাই, "ভাষার বৃহত্তর ইতিহাসে বিদ্রোহী যে আক্ষরিক সম্ভাবনা থাকে, অবিনির্মাণ তাকেও ব্যবহার করে।"[৩৫] তবে "অবিনির্মাণের মতে কিন্তু ভাষাই সব নয়; শুধু দর্শন যেন ভাষাকে সংকীর্ণ না-করে এই তার ইচ্ছা।"[৩৬]

পরিশেষে এই প্রশ্নের উত্তরে আসা যাক, বিনির্মাণ কী? কিংবা বোঝার জন্য আরও সুবিধা হবে যদি প্রশ্ন করা যায়, বিনির্মাণের উদ্দেশ্য কী? বিনির্মাণের উদ্দেশ্য হল, কেন্দ্র, সত্য, উপস্থিতি, চূড়ান্ত ইত্যাদি ধারণার বুনিয়াদকে দুর্বল করা। গায়ত্রী দেবীর মতে, -

> "অবিনির্মাণ টেকসই বস্তুর তাপ্পি খোলে, জ্ঞানের আপাত দৃষ্টিতে সুপ্রতিষ্ঠিত ভূমিতে অন্তহীন কম্প লাগায়...।"[৩৭]

বিনির্মাণ হল স্থিতাবস্থাপন্থার প্রতি অভিব্যক্ত ক্ষোভ, অস্বস্তি ও সংশয়ের সক্রিয় প্রয়োগ কৌশল। চিন্তায়, কর্মে, বাকবন্ধে ও পাঠকৃতিতে যেখানেই প্রধান/ অপ্রধান, মুখ্য/গৌন, সত্য/মিথ্যা, ভালো/মন্দ, কেন্দ্র/প্রান্ত, উঁচু/নীচু ইত্যাদির দ্বৈততাময় কাঠামো তৈরি হয়, যেখানে একটি অন্যটির তুলনায় অবিসংবাদীরূপে অধিক গুরুত্ব প্রাপ্ত হয় এবং যাকে প্রায় স্বতঃসিদ্ধ বলে ভ্রম জন্মে এবং যে বয়ানই চূড়ান্ততার কথা বলে, বিনির্মাণ তাকেই প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়, তাদের প্রতিষ্ঠার অন্তঃসারশূন্যতা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিতে চায়। যাদেরকে অবদমিত করে, কাটছাঁট করে কেন্দ্র, মুখ্য ইত্যাদি ধারণাগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, বিনির্মাণীর কাছে তারাও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কারণ, - "অবিনির্মাণের অবশ্যপ্রশ্ন, বিচার প্রমাণের সাফল্যের খাতিরে কী বাকি পড়ল।"[৩৮] তাই কোনো পাঠকৃতির বিনির্মিত পাঠে যথাপ্রাপ্ত দ্বৈততাময় স্তরবিন্যাস স্থান দখল করে একে অপরের। এই কারণেই Teery Eagleton একে বলেছেন— "reading against the grain."[৩৯]

যাইহোক, সাহিত্য পাঠের ক্ষেত্রে, সহজ কথায়, পাঠকৃতির নিজস্ব যুক্তি পরম্পরাকে 'বিবেচক ঘনিষ্ঠতা'য় (critical intimacy) আলিঙ্গন করে পাঠকৃতির প্রতীয়মান অর্থ বা লেখকের অভিপ্রেত বক্তব্য থেকে সরে দাঁড়ানোর নামই বিনির্মাণ। এক্ষেত্রে বিনির্মাণবাদী সমালোচকের সহায় ও আশ্রয় মূল পাঠকৃতির নিজস্ব যুক্তি পরম্পরার অন্তর্গত কোনো স্ববিরোধী অনুষঙ্গ বা যুক্তির জট, যাকে চিহ্নিত করতে দেরিদা 'aporia' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। 'aporia' সম্পর্কে গায়ত্রী দেবী লিখছেন—

> "এই গ্রিক কথাটির আক্ষরিক অর্থ, যে ব্যবধানের উপর সাঁকো বাঁধা যায় না, যাকে অতিক্রমকরা যায় না। বিস্তৃত অর্থে আপোরিয়া মানে, প্রথম বৈঠকে, সব মীমাংসায় অমীমাংসিতত্ত্বের অশরীরী অধিষ্ঠান; দ্বিতীয় বৈঠকে, এমন একটা অবস্থার সম্মুখীন হওয়া, যেখানে দুটো গতি, দুটোই ঠিক, কিন্তু একে অন্যকে নাকচ করবে। অবস্থা অমীমাংসিতত্ব। কিন্তু অবস্থার গুণে একটা পথ নেওয়া হয়ে যাবে। এবং অপারিয়ার মোচড় আমরা বুঝব অজান্তে পার হওয়ার পরে। তাই তো স্বভাবধার্মিক সৎকাজের পুরস্কার সঞ্জীবনী যন্ত্রণা, অন্য পথের জন্য আক্ষেপ। নাছোড়বান্দা ভাঙাগড়া তাই তো থামতে পারে না।"[৪০]

স্রষ্টার অমনোযোগী প্রয়োগের কারণে হোক কিংবা ভাষার নিজস্ব স্বেচ্ছাচারী ক্রীড়ার কারণে, এই 'aporia'-র অলঙ্ঘনীয় অশরীরী অধিষ্ঠান থেকে পাঠকৃতি মুক্ত হতে পারে না। এই কারণেই বলা হয়, পাঠকৃতি সর্বাদা তার ধ্বংসের বীজ নিজের শরীরে ধারণ করে নিয়ে চলে। আর এই কারণেই বিনির্মাণবাদ প্রত্যাশা করে পাঠকের সচেতন অধ্যাবসায়। তাই দেরিদা বলেন, সচেতনভাবে পাঠকৃতির যুক্তিপরম্পরার নিখুঁত পর্যবেক্ষণ কেবল নয়, বিনির্মানবাদী সমালোচককে নজর রাখতে হবে foot note, end note, টীকা, টিপ্পনীর দিকেও, সেখানেও মিলতে পারে কোনো স্ববিরোধী অনুষঙ্গ। আর একবার এই স্ববিরোধী অনুষঙ্গ পেয়ে গেলেই বাজিমাৎ। সেই ধ্বংসের বীজকে আশ্রয় করেই বিনির্মাণবাদী পাঠক ও সমালোচক পাঠকৃতির নিজস্ব উপাদান অবলম্বন করেই স্রষ্টার অভিপ্রেত অর্থকে খণ্ডন করে গড়ে তোলেন তাঁর নিজস্ব পাঠভূবন।

দেরিদা স্বয়ং স্পষ্টাক্ষরে কোনো পদ্ধতির উল্লেখ করেননি। তবু তাঁর আলোচনা থেকে ঠিক পদ্ধতি নয়, অথচ পদ্ধতির মতো যে সার নিংড়ে নেওয়া যায়, বিভিন্ন সমালোচকের গ্রন্থ অনুসরণ করে এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে তার একটা পরিচয় তুলে ধরা যেতে পারে—

১। বিনির্মাণ পাঠ্যের বিপরীত যুগ্মপদ (bainary opposition) (পুরুষ/নারী, প্রধান/অপ্রধান, নায়ক/খলনায়ক, ইত্যাদি) বিশ্লেষণ করে এবং দেখায় যে, এই যুগ্মপদগুলোর মধ্যে একটির উপরে অন্যটির শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিষ্ঠিত।

২। পাঠ্যের নিজস্ব যুক্তিধাঁচা ক > নেতি ক আওড়াতে আওড়াতে বয়ান যেখানে দুম করে বলে বসে ক < নেতি ক, সেখান থেকেই বিনির্মাণের কথারম্ভ।

৩। এরপর, এই যুক্তির স্ববিরোধীতাকে আশ্রয় করেই বিনির্মাতা বিপরীত যুগ্মপদগুলির বিন্যাস উলটে দেন এবং দেখান যে, যা প্রাধান্যপ্রাপ্ত বলে মনে হয়, তা আসলে অবদমিত 'অপর' দ্বারা প্রশ্নবিদ্ধ বা দুর্বল হয়ে পড়ে।

৪। পরবর্তী পর্যায়ে বিনির্মাণ উভয় শর্তকেই স্থানচ্যুত করে, যাতে নতুন কোনও শ্রেণিবিন্যাস সৃষ্টি না হয়।

অবশ্য বিনির্মাণে পদ্ধতির কোনো কড়াকড়ি নেই। দেরিদার সমসময়ে ও পরবর্তীকালে বিভিন্ন তাত্ত্বিকের আলোচনায় বিনির্মাণের ক্ষেত্র অনেকটাই প্রসারিত হয়েছে। তবে, সমস্ত ক্ষেত্রেই প্রতিষ্ঠতকে অপ্রতিষ্ঠিত করা বিনির্মাণের

প্রাথমিক উদ্দেশ্য। কারণ, বিনির্মাণ যেকোনো প্রকার চূড়ান্ততা, স্থিতাবস্থাকে সংশয়ের চোখে দেখে এবং তাকে শুধু সমালোচনা করেই থেমে থাকে না, তার অপসারণে তৎপর হয়ে ওঠে।

Reference:

১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, জাক দেরিদা: তাঁর বিনির্মাণ, দে'জ, কলকাতা, সেপ্টেম্বর ২০২৩, পৃ. ৪৩-৪৪

২. চক্রবর্তী স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, অপর, অনুষ্টুপ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি, ২০২২, পৃ. ২৪

৩. তদেব, পৃ. ২৪

৪. সংসদ বাংলা অভিধান, পৃ. ৬০৭

৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, অথ বিনির্মাণ, বাংলায় বিনির্মাণ/ অবিনির্মাণ, অনির্বাণ দাশ সম্পাদিত, অবভাস, কলকাতা, জানুয়ারি ২০০৮, পৃ. ১২৩

৬. চক্রবর্তী স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩

৭. Chakravorty Spivak, Gayatri, Translator's Preface, Of Grammatology by Jacques Derrida, translated by Gayatri Chakravorty Spivak, Motilal banarsidass publishers pvt.ltd., Delhi, 2002, page xxi

৮. Nayar, Pramod k., Poststructuralism and Deconstruction, Literary Theory Today, Asia Book Club, New Delhi, 2002, page 52

৯. ভট্টাচার্য, তপোধীর, বিনির্মাণবাদ, প্রতীচ্যের সাহিত্যতত্ত্ব, দে'জ, কলকাতা, ফেব্রুয়ারি ২০০৬, পৃ. ৯৮

১০. John, The Gospel, 1:1, Holy Bible, The Gideons International, India, Page 1009

১১. চক্রবর্তী স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

১২. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, অথ বিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৭৬

১৩. তদেব, পৃ. ৮১

১৪. তদেব, পৃ. ৭৮

১৫. তদেব, পৃ. ৭৬

১৬. তদেব, পৃ. ৭৭-৭৮

১৭. তদেব, পৃ. ৭৮

১৮. Kalupahana, David J., Mulamadhyamakakarika of Nagarjuna : The Philosophy of the Middle Way, Motilal banarsidass publishers pvt.ltd., Delhi, 1999, Page 16-20

১৯. চক্রবর্তী স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৬

২০. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, অথ বিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৪-৮৫

২১. Nayar, Pramod k., Poststructuralism and Deconstruction, Op. cit., P.46

২২. Ibid., P. 46

২৩. Chakravorty Spivak, Gayatri, Translator's Preface, Op.Cit., P. xi

২৪. Nayar, Pramod k., Poststructuralism and Deconstruction, Op. cit., P.51

২৫. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, অথ বিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৯

২৬. Chakravorty Spivak, Gayatri, Translator's Preface, Op. Cit., P. xvii

২৭. Ibid., P. lxix

২৮. বন্দ্যোপাধ্যায়, শিবাজী, অথ বিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ১০৮

২৯. Chakravorty Spivak, Gayatri, Translator's Preface, Op.Cit., P. xii

৩০. Nayar, Pramod k., Poststructuralism and Deconstruction, Op. cit., P. 53

৩১. ভট্টাচার্য, তপোধীর, জাক দেরিদা: তাঁর বিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৮৯

৩২. Nayar, Pramod k., Poststructuralism and Deconstruction, Op. cit., P. 46

৩৩. Kalupahana, David J., Mulamadhyamakakarika of Nagarjuna : The Philosophy of the Middle Way, Op. Cit., P. 18-19

৩৪. চক্রবর্তী, স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৩৫. চক্রবর্তী, স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৩৬. চক্রবর্তী, স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৯

৩৭. চক্রবর্তী, স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ২৭

৩৮. চক্রবর্তী, স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৩০

৩৯. Nayar, Pramod k., Poststructuralism and Deconstruction, Op.cit. P. 54

৪০. চক্রবর্তী, স্পিভাক, গায়ত্রী, অবিনির্মাণ, পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৪